তৃতীয় অধ্যায়

বেজবরুয়া যুগের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের পরিচয়

বেজবরুয়া যুগের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ এবং তার বিভিন্ন ভাব ও রূপের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটি সামনে থাকলে তবে আমরা অসমীয়া সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের প্রভাব নিরূপণে সক্ষম হব । তাই এখানে আমরা ঐ সময়ের বাংলা সাহিত্যেরপ্রধান দিক্ গুলি এবং উল্লেখযোগ্য স্রষ্টাদের সৃষ্টির উল্লেখমাত্র করব, বিস্তৃত আলোচনা নয়, যেহেতু এই সমস্ত তথ্য সর্বজনবিদিত । এই সাহিত্যিকদের প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যিকদের কার কার উপর কি ভাবে পড়েছে, তা' বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে পরবর্তী অধ্যায় সমূহে । 'জোনাকী'র প্রকাশ কাল অর্থাৎ ১৮৮৯ সাল থেকেই বেজবরুয়া যুগের সূচনা কেন ধরা হয় তার আলোচনা পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে । বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ XXXX আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে XXXXXX আরও অন্ততঃ ত্রিশ বছর আগে থেকে অর্থাৎ মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনার সূচনা থেকে । শর্মিষ্ঠার রচনা কাল ১৮৫৯ সাল । সেই নব্য সাহিত্য আন্দোলনের লক্ষণীয় পরিণতি আমরা নির্দেশ করছি রবীন্দ্রনাথের তিরোধান কাল অর্থাৎ ১৯৪১ সাল পর্যন্ত আশী বৎসর । উল্লেখ্য এই যে বেজবরুয়া রবীন্দ্রনাথের তিন বৎসর পূর্বেই ১৯৩৮ সালে তিরোহিত হন ।

কলকাতাতে বিজয়ী ইংরেজগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই নাট্যাভিনয় শুরু করেন । বলা বাহুল্য, ইংরেজের ইংরেজী নাট্যাভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী তরুণের দল রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয়ে প্রয়াসী হয় । প্রথম দিকে ইংরেজী নাটক, তারপর সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হতে থাকে । বাংলা নাটকাভিনয় তারও পরের কথা ।

বাংলা দেশে সর্বপ্রথম নাটমঞ্চে বাংলা নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন এক রুশীয় ভদ্রলোক, নাম হেরাসিম লেবেডফ (অথবা জেরাসিম ?) চীনে বাজারের কাছে ডোমতলা লেনে তিনি 'বেঙ্গলী থিয়েটার' স্থাপন করেন । এই নাটমঞ্চে "ডিজগাইজ" (১৭৯৫) এবং 'লাভ ইজ দি বেস্ট ডকটর, (১৭৯৬)

নামক দু'টি ইংরেজী নাটক প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করিয়ে বাঙালী অভিনেতা - অভিনেত্রী দিয়ে তিনি অভিনয় করিয়েছিলেন । সেই থেকে বাংলা নাটকের শুভযাত্রা শুরু হয়েছে । আধুনিক বাংলা নাটকে প্রাণসঞ্চার করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত । মধুসূদনের পূর্বে যেসব নাটক - প্রহসন রচিত হয়েছে তার মধ্যে যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'(১৮৫২), তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২), রাম নারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব'(১৮৫৪) উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬) শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় ।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব নাট্যকার রূপে, তাঁর মতে 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে'। তাই তিনি উৎকৃষ্ট নাটক লিখতে ব্রতী হয়েছিলেন । তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নাটকটির উপজীব্য বিষয় বহু জনশ্রুত মহাভারতের আদিপর্বের অর্ন্তভুক্ত শর্মিষ্ঠা - দেবযানী - যযাতি প্রণয়-বৃত্ত । মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক'পদ্মাবতী'(১৮৬০) গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত গল্প 'এ্যাপল অব্ ডিসকর্ড' অবলম্বনে রচিত । তিনি ভারতীয় ছাঁচে পাশ্চাত্য গল্পটি পরিবেশন করেছেন । মধুসূদন এই নাটকের কলির উক্তিতে কয়েকছত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন । সূচনা হল কাব্যে ছন্দোগত বিপ্লবের। কর্ণেল টডের 'এ্যানালস্ এ্যান্ড এ্যান্টিকুইটিস অব রাজস্থান' থেকে কাহিনী নিয়ে মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী'নাটক (১৮৬১) রচনা করেন । এই নাটকের নায়িকা কৃষ্ণা আত্মহত্যা করে পিতা ও পিতৃরাজ্যকে নিশ্চিন্ত করেন । বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই ট্রাজিক নাটকের স্থান বেশ উচ্চে ।

পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সিংহ ভ্রাতাদের অনুরোধে মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এই দু'টি প্রহসন রচনা করেন । প্রথমটিতে নাগরিক কলকাতার তরুণ সমাজকে এবং দ্বিতীয়টিতে গ্রাম বাংলার ধর্মধ্বজী বৃদ্ধদের আক্রমণ করা হয়েছে । মধুসূদন মূলত: কবি, তথাপি নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় ।

মধুসূদন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের সূচনা করেন । তারপর দীনবন্ধু মিত্র সমসাময়িক সমাজজীবনের অতি উজ্জ্বল আলেখ্য রচনা

করেন । দীনবন্ধুর অমর সৃষ্টি 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) । নীলকর সাহেবদের নির্মম অত্যাচারের কথা এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে । প্রহসন তথা প্রহসনধর্মী নাটকও দীনবন্ধু লিখেছেন ,। যেমন -'সধবার একাদশী'(১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', (xxxxx ১৮৬৬)'জামাই বারিক' (১৮৭২),। এতে তাঁর প্রতিভা আত্মপ্রকাশের যথার্থ পথ খুঁজে পেয়েছে । দীনবন্ধু কমেডি রচনায় সিদ্ধহস্ত । মধুসূদন থেকে ('শর্মিষ্ঠার' প্রকাশ কাল ১৮৫৯) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (তাঁর প্রথম গীতিনাট্যের প্রকাশ কাল ১৮৭৭) পর্যন্ত কয়েকজন নাটকার নাট্যকার মঞ্চসফল অনেকগুলি নাটক রচনা করেন । তাঁরা হলেন মনোমোহন বসু , (১৮৩১ - ১৯১২) জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, (১৮৪৮ - ১৯২৫) রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯ - ১৮৯৪) এবং উপেন্দ্র নাথ দাস (১২৫৫ - ১৩০২ বাং) ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত আমরা দু'জন প্রতিভাশালী নাট্যকার পাই । এঁদের একজন নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৪৪ - ১৯১১) অন্য এবং অন্যজন রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫৩ - ১৯২৯)। গিরিশ চন্দ্র ছিলেন একাধারে নট - নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক । গিরিশচন্দ্রের 'অভিমন্যু বধ' (১৮৬১), 'জনা'(১৮৭৪), 'পান্ডব গৌরব' (১৯০০) মঞ্চসফল নাটক, এগুলি নানা স্থানে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় । তাঁর পৌরাণিক ও ভক্তিরসাত্মক নাটকে তাঁর অকপট হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় । সমসাময়িক রাজনৈতিক ও স্বাদেশিক উত্তাপও তাঁর কয়েকটি নাটকে ফুটে উঠেছে । যেমন – 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম'(১৯০৬) প্রভৃতি।সামাজিক নাটকও তিনি লিখেছেন । তাঁর 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) সর্বাধিক জনপ্রিয় মঞ্চসফল নাটক । 'যোগেশের সাজানো বাগান শুকিয়ে' যাওয়ার কাহিনী এই নাটকে অত্যন্ত আবেগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে ।

গিরিশচন্দ্র উচ্চারণ ও অভিনয়ের সুবিধার জন্য ১৪ মাত্রার অমিত্রাক্ষর পঙ্‌ক্তিকে ভেঙ্গে ছোট ছোট ছত্রে বিভক্ত করেন । এই ছন্দোবৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত । এই ছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতই একদা জনপ্রিয় হয়েছিল ।অমৃতলাল বসু রঙ্গ - নাটক ব্যঙ্গ প্রহসন রচনাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন । সেজন্য তিনি 'রসরাজ' বলে পরিচিত ।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উন্মাদনার কালে ছোট বড় অনেক নাট্যকার জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচনা করেন। এই ধারার নাট্যকারদের মধ্যে প্রথমই নাম করতে হয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের (১৮৬৩ - ১৯১৬)। তাঁর রচনার শুরু জাতীয়তাবোধে এবং উত্তরণ বিশ্ববোধের অমৃত লোকে।। দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক কয়টি নাটক রচনা করেন। যেমন – 'প্রতাপসিংহ'(১৯০৫), 'সীতা'(১৯০৮), 'মেবার পতন'(১৯০৮), 'সাজাহান'(১৯০১), প্রভৃতি। বাংলার বাইরেও তাঁর নাটক অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাষা কাব্যময় অলংকারবহুল। তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তা এখনও বিদ্যমান। তাঁর নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সাজাহান'। অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব কম নয়।

এই সময়কার আরেকজন জনপ্রিয় নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪ - ১৯২৭)। 'নন্দকুমার'(১৩১৪), 'আলমগীর'(১৯২১), 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। তাঁর নাটকে বহির্ঘটনাগত বিস্তারের চেয়ে অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বসৃষ্টির প্রয়াসই বেশী করে পরিলক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ মূলত: গীতিকবি, তাঁর নাটক তাঁর কাব্য প্রত্যয়েরই বাহন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'(১৮৮৪), 'চিত্রাঙ্গদা'(১৮৯২), 'মালিনী'(১৮৯৬), 'ডাকঘর'(১৯১২), 'মুক্তধারা'(১৯২৫), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), প্রভৃতি তাঁর নাট্যপ্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তি। নাটকের কোন কোন শাখায় তিনি অসাধারণ এবং মৌলিক, বিশেষত: কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য ও রূপক - সাংকেতিক নাটকে।

।। মহাকাব্য ।।

১৮৫৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়। তিনি পুরাতন ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজী শিক্ষাপ্রণালী দেশের সর্বত্র ক্রমশ: ছড়িয়ে পড়েছে, আয়োজন চলেছে বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের। পাশ্চাত্য জীবন - দর্শন ও রূপ কাব্যপ্রত্যয়ী বাঙালী

সারস্বত সাধককে নব দিগন্তে ব্যাকুল করে তোলে । রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ আধুনিক জীবনোল্লাসের দ্বার উন্মোচন করেন । বস্তুতঃ এঁরাই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী রেনেসাঁস তথা নবজাগৃতি আন্দোলনের নান্দী পাঠ করলেন । রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭ - ১৮৮৭) ইংরেজী ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্যের আদর্শে রাজপুত দেশ প্রেমের ঘটনা অবলম্বনে স্বদেশ - প্রেম - আশ্রিত ইতিহাসভিত্তিক 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) আখ্যানকাব্যের পত্তন করেন । এই হিসেবে বাংলা কাব্যে পালা বদল - এর রাজগৌরব সর্বপ্রথম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়েরই প্রাপ্য । ২ তারপর এলেন নবজীবনের বার্তাবহ হয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ৭৩) । বাংলা কাব্যের অঙ্গনে তাঁর লেখনী - স্পর্শে প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল । এতদিনের মধ্যযুগীয় ও ধর্মীয় জীবনপ্রত্যয় ও কাব্যাদর্শের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হল । সেই সঙ্গে নতুন কাব্যরূপ ও জীবন প্রত্যয় দেখা গেল । পাশ্চাত্য আদর্শে মধুসূদন মহাকাব্য (রীতিসিদ্ধ মহাকাব্য না হলেও যাকে মহৎকাব্য বলা চলে) আখ্যানকাব্য, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি রচনা করে কেবল বাংলা সাহিত্যে নয় ভারতীয় অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যেও অমর হয়ে আছেন । 'তাঁহা ইংরেজ' 'নব প্রমিথিউস' এই মহা-কবির অমর সৃষ্টি 'মেঘনাদ বধ কাব্য'(১৮৬০) । এই কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত । অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা হিসেবে বাঙালী পাঠক তাঁকে তাঁকে কোনোদিন বিস্মৃত হতে পারবে না । এই ছন্দে রচিত তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব'(১৮৬০)। তাঁর পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও (১৮৬২) এই ছন্দে রচিত । বাংলায় সনেট রচয়িতা হিসেবেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন । মধুসূদন বাংলাকাব্যে যুগপুরুষ । তিনিই রাবণ-মেঘনাদকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন ।'বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন সুকীয় মানবজাবোধ এবং জাগ্রত বুদ্ধিতে ভাগ্য বিড়ম্বিত রাবণ ও মেঘনাদের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইলেন মনুষ্যত্ব ও পুরুষকারের মহিমা'। ৩

নানান ধরণের কাব্য, লিরিক কবিতা , ব্যঙ্গরঙ্গের কবিতা, নাটকানুবাদ, কবিতানুবাদ প্রভৃতির দ্বারা একজন বঙ্গ সন্তান আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন, ইনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । হেমচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'বৃত্র সংহার' (প্রথম খন্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খন্ড - ১৮৭৭) ।'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র

পরেই এই কাব্যের স্থান । এই কাব্যে দেবতাদের স্বদেশপ্রেম ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা প্রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় । তাঁর 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪) স্বদেশ প্রেমের কাব্য । তাঁর প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশ প্রেমাশ্রিত কয়েকটি কবিতা এখনও স্মরণীয় । তাঁর 'হতাশার আক্ষেপ', 'ভারত সংগীত' কবিতা এক সময় সাধারণ পাঠকের কণ্ঠস্থ ছিল । লং ফেলোর কবিতা 'The Psalm of life' -এর অনুবাদ 'জীবনসঙ্গীত' কবিতাটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল ।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭ - ১৯০৯) এক সময় সমগ্র দেশে 'পলাশীর যুদ্ধের (১৮৭৫) কবি বলে পরিচিত হয়েছিলেন । কেউ কেউ তাঁকে বাংলার বায়রণও বলতেন ।'পলাশীর যুদ্ধ' ইতিহাসাশ্রিত স্বদেশপ্রেমের আখ্যান কাব্য । তাঁর 'রঙ্গমতী'(১৮৮০)কাল্পনিক, রোমান্টিক ও স্বদেশপ্রেমের কাহিনী । নবীন চন্দ্রের রৈবতক - কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের প্রভাসে'র (১৮৮৭ - ১৮৯৬) নামে সর্বজন বিদিত । শ্রী কৃষ্ণের পূত চরিত্র অবলম্বনে এই ত্রয়ীকাব্য রচিত । সেখানে শ্রেষ্ঠ মানব কৃষ্ণ - চরিত্রের মাধ্যমে ভাবী ভারতের সামাজিক/ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঐক্য প্রচারিত হয়েছে নবযুগের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল । নবীনচন্দ্রের অধিকাংশ রচনায় স্বদেশ প্রেম তথা মানব প্রেম প্রাধান্য পেয়েছে । সেই সঙ্গে বিশ্বচেতনাও তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছে । ৪ রঙ্গলালের কাব্যে যে বীজ রোপিত হয়েছিল, মধুসূদন - হেমচন্দ্র তা মহীরুহে পরিণত হয়ে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত সগৌরবে স্বীয় মহিমা অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল, তারপর মহাকাব্যের এই ধারাটি বিস্মৃতির বালুকাতলে অবলুপ্ত হয়ে যায়, আসে গীতি কবিতার প্রবল প্রবাহ । গীতিরস বাঙ্গালীর মজ্জাগত । জয়দেব থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা কাব্য প্রধানত: গীতিরসসিক্ত । মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের অনুবর্তী নবীনচন্দ্র যখন মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তখনই এই মহাকাব্যের মহাস্রোতের পাশাপাশি দু'টি অনুদ্বেলিত স্রোত প্রবহমান ছিল বাংলা সাহিত্যে । এই স্রোতদ্বয়ের একটি গীতিকাব্য-ধারা, অন্যটি আখ্যানকাব্য-ধারা । আখ্যান কাব্যে ছিল মহাকাব্যের মত কাহিনীরস, ছিল গীতিকবিতার মত রোমাঞ্চকর কল্পনা প্রাধান্য। মহাকাব্যের মত আখ্যানকাব্যের ধারাটিও শুকিয়ে গেল । তার স্থানে গীতিরস গীতিকবিতার ধারাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হল । ৫

।। গীতিকাব্য ।।

গীতি কবিতার জন্ম সূক্ষ্ম তীব্র ব্যক্তি অনুভূতি থেকে । গীতি কবিতা কবির ব্যক্তি - চেতনার রঙে রঙীন মনের মাধুরিমা জড়ান । গীতিকবিতা আত্মলীন কাব্য । আধুনিক গীতিকবিতার প্রথম সচেতন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫ - ১৮৯৪) । পাঠকগণ মহাকাব্যের বিশাল প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে অন্তর্লোকের সুদূর অভিসারে যাত্রা করলেন । বাংলা কাব্যের এই পালাবদলের যথার্থ সূচনা বিহারীলাল থেকে, যদিও মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভাষার প্রতি' (১৮৬২) কবিতা দু'টিতে এই গীতিলক্ষণ কিছুটা আত্ম প্রকাশ করেছিল । বিহারীলালের 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্য (xxxxxx ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয় । এতে জড় প্রকৃতির একটি প্রাণময় সত্তা স্বীকৃত হয়েছে । তাঁর 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) কবি - মানসীর একটি সুচিরস্থায়ী আলেখ্য । এই কাব্যটির দ্বারা রবীন্দ্রনাথও প্রভাবিত হয়েছেন । এই কাব্যই তাঁকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিদের গুরুস্থানীয় করেছে । রবীন্দ্রনাথ-সমসাময়িক গীতিকবিদের মধ্যে সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার (১৮৩৮ - ৭৮) অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০ - ১৯১৯) দেবেন্দ্রনাথ সেন , (১৮৫৮ - ১৯২০) গোবিন্দ চন্দ্র দাস (১৮৫৪ - ১৯১৮) প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ।

গীতিকবিতার চরম সূক্ষ্ম রূপ পাই রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১ - ১৯৪১) । মাত্র বার বৎসর বয়স থেকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন । ৮০ বৎসর পর্যন্ত তিনি গীতি কাব্যের প্লাবন বইয়ে দিয়েছেন । প্রাণশক্তির প্রচুরতায় ভাবাবেগের গভীরতায় রোমান্টিক মানসের কল্প - সুর্গ - পরিক্রমায় রূপ -অরূপের লীলার তাৎপর্য বর্ণনায় তাঁর কাব্য অনবদ্য । রবীন্দ্রনাথ বহু কাব্য রচনা করেছেন । তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য - 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮০), 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) , 'বলাকা' (১৯১৬) প্রভৃতি ।

১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ সালের রচনায় কবি সর্বপ্রথম রোমান্টিক স্বপ্নলোক থেকে প্রাত্যহিকলোকে অবতরণ করলেন । এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কাব্য

'সন্ধ্যা সঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান'(১৮৮৪), 'ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)। এই পর্ব থেকেই কবির কাব্যধারার যথার্থ বিকাশের সূচনা। 'প্রভাত সঙ্গীতের' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রবীন্দ্র কাব্যধারার একটি বিশিষ্ট কবিতা। এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের নব্য দৃষ্টিভঙ্গীর দ্যোতক হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। রবীন্দ্র কাব্যজীবনের প্রথম সুকীয়তার সূচনা পরিলক্ষিত হয় 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। এই কাব্যে রবীন্দ্র নাথের মর্ত্যপ্রীতি পরিশুদ্ধ রূপে হয়েছে।

'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালী' (১৮৯৬) এই কাব্য চতুষ্টয় কবির ৩০ থেকে ৩৫ বৎসরের মধ্যে রচিত। 'মানসী' তে রবীন্দ্রনাথের কাব্য স্বরূপে স্থিত হতে চলেছে। এতে আছে চিত্ররীতি ও সঙ্গীত রীতির কবিতা। 'সোনার তরী'তে কবি - প্রতিভা পরিণতি লাভ করেছে। 'যেতে নাহি দিব', 'বসুন্ধরা', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা এই কাব্যের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'জীবন দেবতা', 'প্রেমের অভিষেক', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' 'এবার ফিরাও মোরে', 'উর্বশী'। এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় জীবনদেবতার উপলব্ধি, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, বৃহৎ জীবনের জয়গান প্রকাশিত হয়েছে। 'কল্পনা' কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'দুঃসময়' 'স্বপ্ন', 'বর্ষামঙ্গল' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকায়' লিরিক প্রধান্য। 'নৈবেদ্য' আইডিয়া প্রধান কাব্য। 'রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির' কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। 'বলাকা' কাব্যের 'সাজাহান' 'ছবি', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'পুনশ্চ' থেকে রবীন্দ্রনাথের নতুন কাব্যোপলব্ধি সূচিত হয়। এই কাব্য থেকেই গদ্য - কবিতার সূচনা, এবং 'শ্যামলী' পর্যন্ত গদ্য - ছন্দই রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের বাহন হয়েছিল। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন — "গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে বিশ্বসংস্কৃতির যে ধারাপ্রবাহ চলেছে, রবীন্দ্রকাব্য যে তারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তাতে কোন সন্দেহ নেই"। [৬]

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আশীর্বাদ নিয়ে যাঁরা বাংলা কাব্যের প্রাঙ্গণে অঙ্গণে

প্রবেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ছন্দোরাজা বলতেন । তাঁর 'কুহু ও কেকা'(১৯১২) কবিতা গ্রন্থটি সর্বজনবিদিত । কেবল মৌলিক কবিতা নয়, তিনি অনেক অনুবাদ কবিতাও লিখেছেন । (দ্রঃ 'তীর্থ সলিল'(১৯০৮), তীর্থরেণু'(১৯১০) । তাঁর কবিতায় ভাব গভীরতা ছিল না, ছিল রূপসৌন্দর্য , আপাত শ্রুতিসুখকর ধ্বনিসৌন্দর্য ।

সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র - প্রভাবিত হলেও স্বকীয়তা বর্জিত নন, এবং রবীন্দ্রযুগেও যে তিনি কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তা' সম্ভবতঃ ঐ স্বকীয়তার জন্যই । সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের অনেক আধুনিক কবির মধ্যে অনুভূত হয় । যেমন - সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রভৃতি । আঙ্গিক ও ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । তবে একথা স্বীকার করতেই হবে 'তাঁর কবিতার মনোধর্মের অভাব অত্যন্ত শোকাবহ ভাবে আমাদের আঘাত করে'।[৭]

সত্যেন্দ্রনাথের সমসাময়িক আরেকজন কবি রণভেরী নিয়ে কাব্যের অঙ্গনে উন্মাদনা সঞ্চার করেন। ইনি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ - ১৯৭৬)। দেশের সমস্ত মানুষকে তিনি যৌবনধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন । তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহীর' 'বল বীর বল উন্নত মম শির' এখন একরকম প্রবাদে পর্যবসিত । তাঁর 'অগ্নিবীণা' বঙ্গবাণীকে ঝংকৃত করেছে উচ্চ সুরে । নজরুল গানও লিখেছেন । তাঁর গান 'নজরুল-গীতি' নামে পরিচিত । একথা ঠিক তাঁর অনেক কবিতা 'ভাবালুতায় আবিল , অনর্গল অচেতন বাক্য বিন্যাসের রুদ্ধস্রোত',[৮] তবু অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যে নজরুলের উদ্দীপনাময়ী কবিতার প্রভূত প্রভাব লক্ষণীয় ।

আরও দু'জন কবি এই গীতিকাব্য ধারায় স্মরণীয় । তাঁরা হলেন -- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার । যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা কাব্য - বীণায় একটি নতুন সুর তুললেন, তা হল দুঃখবাদ । সমসাময়িক বাংলা কাব্যে তাঁর প্রভাব পড়েছে ভাবের দিক থেকে নয় , রূপের দিক থেকে ।[৯]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় যেমন দুঃখবাদ প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি মোহিতলালের কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে তন্ত্রধর্মী নির্ভীক দেহবাদ ।[১০] গীতিকাব্য ধারায় কয়েকজন মহিলা কবির নামও অবশ্যই স্মরণীয় । তাঁরা হলেন

গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, কামিনী রায়, প্রিয়ংবদা দেবী, মানকুমারী বসু এবং স্বর্ণকুমারী দেবী। হিন্দু ঘরের কুলবধূর মর্মব্যথা, বৈধব্য যন্ত্রণা, পতিভক্তি, পারিবারিক জীবন - এই ছিল অধিকাংশ মহিলা কবির কাব্য রচনার বিষয়বস্তু। ১৯৩৪ সাল থেকে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের কাব্য সাধনায় ভিন্নতর পথ সন্ধানে নিয়োজিত হয়, এবং একটি বিশিষ্ট সুর-প্রধারা সৃষ্টি করে তোলে। এদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ্য।

।। উপন্যাস ।।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাস রচিত হতে থাকে। অবশ্য ইতিপূর্বে প্যারিচাঁদ মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাস জাতীয় রচনার গোড়া পত্তন করেছিলেন। গল্প - আখ্যানকে দুইভাগে ভাগ করা হয় – রোমান্স ও উপন্যাস। রোমান্স কল্পনা প্রধান আখ্যান, উপন্যাস বাস্তবধর্মী কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাণবাণী তথা জীবনরসে উদ্বোধিত করেন। এই মহৎ কর্মে তাঁর 'বঙ্গদর্শনের'(১৮৭২) ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বঙ্গবাসী আত্মদর্শনের ঋক্‌মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল এই মাসিক পত্রিকাটিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৫ - ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত মোট ১৪ টি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম'। বঙ্কিমের উপন্যাসকে আলোচনার সুবিধার জন্য মোটামুটি তিনটি শ্রেনীতে ভাগ করা হয়। যদিও এই শ্রেনীবিন্যাস খুব সূক্ষ্ম নয়।

১। ইতিহাস ও রোমান্স
২। তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস
৩। সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস

ইতিহাস ও রোমান্স

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, সীতারাম প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরমধ্যে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে 'রাজসিংহ'কেই বুঝায়। বাকিগুলিতে আছে ইতিহাসের পটে সাধারণ মানুষের কথা। 'কপালকুণ্ডলা' তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ।

তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস

'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' এই জাতীয় উপন্যাস। 'আনন্দমঠ' বঙ্কিমের দেশাত্মবোধের মহাকাব্য। এই উপন্যাসের বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি এখনও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত মানুষের মুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। 'দেবী চৌধুরাণী'র বিষয়বস্তু একটি মনোরম গার্হস্থ্য কাহিনী, সেই সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে সূক্ষ্মধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দুর সামাজিক আচার - আচরণের কথা।

সমাজ ও গার্হস্থ্য উপন্যাস

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি এই শ্রেণীর [illegible] উপন্যাস। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অনিবার্য রূপতৃষ্ণা ও রূপমুগ্ধ পুরুষ-রমনীর প্রবৃত্তি দমনে অক্ষমতার পরিণতি দেখান হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমের নৈপুণ্য প্রশ্নাতীত, এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বঙ্কিমের বিপুল প্রভাব অনস্বীকার্য।

বঙ্কিমের পরেই নাম করতে হয় রমেশ চন্দ্র দত্তের (১৮৪৮ - ১৯০৯)। তিনি সর্বমোট ৬টি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির নাম — 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবী কঙ্কণ (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৮৯),। এরমধ্যে প্রথম দু'খানি ঐতিহাসিক রোমান্স, 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' হল রমেশ চন্দ্রের দু'টি যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাঁর সামাজিক উপন্যাস 'সংসারে' (১৮৮৬) বিধবা বিবাহকে এবং 'সমাজে' (১৮৯৪) অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আরেক জন যশস্বী লেখক । তাঁর স্বর্ণলতা (১৮৭৪) উপন্যাসটি অত্যধিক জনপ্রিয় উপন্যাস । 'স্বর্ণলতার' অভিনয়যোগ্য সংস্করণ'সরলা' । জীবদ্দশাতেই গ্রন্থটির সাতটি সংস্করণ সংস্করণ প্রকাশিত হয় । ঊনবিংশ শতাব্দীর একান্নবর্তী পরিবারের সমস্যা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু । বঙ্কিমযুগে একাধিক উপন্যাস রচনা লিখে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি । এঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে না বলে আমরা সরাসরি পৌঁছে যাবো রবীন্দ্রনাথে, কেননা বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তাঁর উপন্যাসে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষণীয় । রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণের বৈপ্লবিক নূতনত্ব সঞ্চারিত হয় । শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটিকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক বলে চিহ্নিত করেছেন । [১১] বিনোদিনী বাল বিধবা । তার চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আসক্তির জাগৃতি ও তার মানসিক পট পরিবর্তনের টানা - পোড়েন এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র (১৯১০) নাম তো সর্বজন বিদিত । একটা গোটা জাতির মানসিক সঙ্কটের এবং তা থেকে উত্তরণের কাহিনী এর মূল বক্তব্য । এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'ঘরে- বাইরে' (১৯১৬) ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উগ্র স্বাদেশিকতার সঙ্গে নরনারীর চিত্ত বিক্ষোভ যুক্ত হয়ে গভীর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে । 'যোগাযোগ' (১৯২৯) দুটি ভিন্ন মানসিকতা ও সংস্কৃতির পরিবারে বৈবাহিক সম্বন্ধ থেকে উদ্ভূত সংঘাতের কাহিনী । আবার'শেষের কবিতা'(১৯২৯) এক অপূর্ব কাব্যধর্মী রোমান্টিক কাহিনী । তারপর নাম করতে হয় শরৎচন্দ্রের । বাঙালী জীবনের সুখ দুঃখ ও অশ্রু - বেদনাকে সহানুভূতির রসে সিঞ্চিত করে এমন স্নিগ্ধ মধুর ও বেদনা বিধুর কাহিনী আর কেউ লিখতে পারেন নি । তাঁর সাহিত্যে মানুষের বেদনার ছবি এমন সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে যে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল । তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস একসময়ে বাংলার বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস ছিল । তাঁর এতদ্ব্যতীত তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল - 'পল্লী - সমাজ' (১৯১৬), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭), 'দেবদাস'(১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০) , 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭ - ৩৩) প্রভৃতি । শ্রীকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – শরৎচন্দ্র " আমাদের সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া এক সঙ্গে সুধীন চিন্তা ও করুণ রসের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন , এই আত্মপীড়ন নিরত জাতির ভগবদ্দত্ত দুঃখ যে নিজ মূঢ়তায় কত বাড়িয়াছে , তাহা দেখাইয়াছেন" । [১২] মানুষের জন্যই সমাজ ও পরিবার । সেই সমাজ ও পরিবার যখন মানুষকে পিষে মারতে চেয়েছে, তখন তিনি মানুষেরই পক্ষ নিয়েছেন ।

।। ছোটগল্প ।।

ছোট গল্প গল্প আখ্যানসর্বস্ব নয় । মানব জীবনের কোনো একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করাই ছোট গল্পের লক্ষণ । বাংলা ছোট গল্পের জীবন দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ । তিনিই প্রথম সচেতন ভাবে ছোট গল্প লিখতে ব্রতী হন । তিনিই এর পথিকৃৎ এবং সেই শ্রেষ্ঠ শিল্পী । রবীন্দ্রনাথের গল্প গ্রন্থ 'গল্প গুচ্ছ'তিন খন্ডে প্রকাশিত । বাঙালী জীবনের আধারে পরিবেশিত হলেও চিরন্তন মানুষের সুখ দুঃখ এতে স্থান পেয়েছে । বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছোট গল্প লিখেছেন ।'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'ঠাকুর্দা', 'অতিথি' , 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'সুভা', 'স্ত্রীর পত্র' প্রভৃতি গল্প তাঁর অমর সৃষ্টি । ছোট গল্প রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্থান টলস্টয় , মোপাসাঁ , চেখভের পাশেই ।

'রমাসুন্দরী'; নবীন সন্ন্যাসী', 'সিন্দুরকৌটা', 'রত্নদ্বীপ' প্রভৃতি উপন্যাস লিখলেও বাংলা সাহিত্যে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ((১৮৭৩ - ১৯৩২) খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে তাঁর সুন্দর ছোট গল্প সমূহের জন্য । তাঁকে কেউ কেউ বলেছেন বাংলার মোপাসাঁ । 'নবকথা'(১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬) প্রভৃতি তাঁর গল্প সংকলনের নাম । অন্তর্দৃষ্টি ও গভীরতা না থাকলেও তাঁর গল্পগুলি সুখপাঠ্য কথারসে ভরপুর ।

ছোট গল্প শরৎচন্দ্রও লিখেছেন । যেমন –'মন্দির' (কুন্তলীন পুরস্কার গ্রন্থ), 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতি । এ গুলিকে ঠিক যথার্থ ছোট গল্প বলা যায় না ।

।। প্রবন্ধ সাহিত্য ও রস রচনা ।।

বাংলা গদ্যের যথার্থ সূচনা যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই (১৮০১), তবু তার সাহিত্যিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হল বিদ্যাসাগরের হাতে (১৮৪৮) । গদ্যরীতি যখন থেকে গভীর চিন্তা ও ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়ে উঠল। তখন থেকে সৃষ্টি হতে লাগলো মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্য ।বিদ্যাসাগর , ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতির অনুশীলিত এই প্রবন্ধ সাহিত্য চিন্তা, যুক্তি, মনন ও সংযত প্রকাশ ভঙ্গির মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে । তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গ্রন্থ হল —'বিবিধ প্রবন্ধ', 'কৃষ্ণ চরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি । প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিপূরকরূপে পাশে পাশেই গড়ে উঠলো রচনা সাহিত্য (Essais) যার প্রধান বৈশিষ্ট্য তত্ত্বগাম্ভীর্য বা তথ্যপ্রাধান্য নয়, রস রসিকতা ও সুনিপুণ প্রকাশ ভঙ্গির মুন্সিয়ানায় তত্ত্ব ও তথ্যের ভারকে লাঘব করা , পাঠককে যুগপৎ আনন্দিত ও বুদ্ধিদীপ্ত ক'রে তোলা । এক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র পথিকৃৎ । তাঁর 'লোক রহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' এই হিসাবে এখনো তুলনাহীন । 'কমলাকান্তের দপ্তরে' পাই বঙ্কিমের ব্যক্তিমানসের অভিব্যক্তি , গীতি কবিতার আবেগ , নাটকীয় পরিস্থিতির আভাস, গভীর দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন সব কিছু মিলিয়ে এক অপূর্ব উপভোগ্যতার আস্বাদ । তাই ভারতীয় নানা সাহিত্যে ~~হরপ্রসাদ~~ প্রভাব পড়েছে এই কমলাকান্তের দপ্তরের। বঙ্কিমের পরে মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় , চন্দ্রনাথ বসু , কেশব চন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে । কিন্তু রচনা সাহিত্য বা রস রচনার (আধুনিক নাম 'রম্য রচনা') আরও উজ্জ্বল রূপ পেলাম রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধে', কিন্তু তার স্বাদ একেবারে ভিন্নতর, তাই তার দোসরও নেই , অনুকারকও নেই ।

পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বেজবরুয়া-যুগে সৃষ্ট অসমীয়া সাহিত্য এই বাংলা সাহিত্য থেকে কিভাবে কতখানি পুষ্টিরস আহরণ করেছে তার ধারাবাহিক আলোচনা করব কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও রসরচনা পর্যায় ভাগ করে। বলাবাহুল্য, সৃজনশীল সাহিত্যকেই অর্থাৎ 'লিটারেচার অব্ পাওয়ার'কেই ('লিটারেচার অব নলেজ' নয়) আমরা প্রভাব গ্রহণক্ষম সৃষ্টি বলে গণ্য করেছি এই আলোচনায়। তাই এতে স্থান পেয়েছে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও রসরচনা।

তথ্যপূর্ণ ~~xxxxx~~ যুক্তিবিচার সমৃদ্ধ ~~x~~ প্রবন্ধও রচনার গুণে রসসিক্ত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ঐ ধরনের প্রবন্ধকে আমরা এই বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিনি, কেননা তাদের সীমারেখা (demarcating line) নির্ণয় করা শক্ত। তাই অসমীয়া সাহিত্যের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও বিবিধ সমালোচনা প্রভৃতি এই আলোচনার পরিধিভুক্ত হয়নি।

সূত্র নির্দেশ

১। 'ভূমিকা -' সাজাহান — অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত-শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৪৭২ ২য় সং।
৩। নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি — ডঃ সুবোধ রঞ্জন রায়, পৃ: ২২।
৪। ঐ — ঐ পৃ: ৩৩।
৫। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
পৃ: ৫১০ ২য় সং।
৬। ঐ পৃ: ৬১১, ২য় সং।
৭। কবিতার কথা— জীবনানন্দ দাস, পৃ: ২০।
৮। কালের পুতুল— বুদ্ধদেব বসু, পৃ: ১৫৭।
৯। বুদ্ধদেব বসু, 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রবন্ধ, 'কবিতা পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৬১।
১০। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়— দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃ: ৫৯, ৩য় সং, ১৯৬৪।
১১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৩৯, ৫ম সং।
১২। ঐ — ঐ পৃ: ২৪২।